প্রথম বিধবা বিবাহের খোঁজে

মানবেন্দ্র নস্কর

আজ থেকে ঠিক এক'শ পঁয়ষট্টি বছর আগেকার কথা। ১৮৫৬ সাল। ৭ই ডিসেম্বর, রবিবার। স্থান কলকাতার ১২ নম্বর সুকিয়া স্ট্রিট। অধুনা ৪৮এ এবং ৪৮বি, কৈলাস বসু স্ট্রিট। রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি। সন্ধ্যা সমাগত। বিয়ের বাদ্যি বেজে উঠল। ঝাড়লণ্ঠনের আলোর রসনাই। মান্যগণ্যদের আনাগোনা। অন্তঃপুরে মহিলাদের ব্যবস্ততা। আয়োজনের তেমন কোনও ঘাটতি নেই। পাত্র বর্তমান উত্তর ২৪ পরগনা জেলার খাঁটুরা গ্রামের ভঙ্গকুলীন শাণ্ডিল্য বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের সন্তান। পেশায় মুর্শিদাবাদ জেলার জজ পণ্ডিত। বাবা নামজাদা কথক রামধন তর্কবাগীশ। পাত্রী বর্ধমান জেলার পলাশডাঙা গ্রামের ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের বালবিধবা কন্যা। বয়স দশ বছর। বিয়েটা নিয়ে পাড়া-পড়শি, সাধারণ মানুষের জল্পনা-কল্পনা আর কৌতূহলের অন্ত নেই। আনাচে-কানাচে সন্দেহবাদীদের উঁকিঝুকি। গুজুর গুজুর, ফুসুর ফুসুর। কি হয় না হয়। বিয়ের কার্যকর্তাদের ঘুম ছুটেছে। সর্বদাই ব্যস্ত। সবমিলিয়ে বিয়ে বাড়িটি গমগম করছে। পাত্রী বিয়ের সাজে সুসজ্জিতা। ১২ নম্বর সুকিয়া স্ট্রিট এবং তার আশপাশে বহু মানুষের ঢল। কর্মকর্তাদের কর্মচঞ্চলতা চোখ তুলে তাকালেই শুধু মাথা আর কালো মাথা। বাহারি বেশভূষা দেখার মতো। মহিলারা পাত্রীর কাছে অপেক্ষারতা। বরাগমনের আশায় তাঁরা ঠায় দাঁড়িয়ে। কারও হাতে শঙ্খ, কারও হাতে ফুল। সব প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে শেষে রাম ঘোষের বড়ো জুড়ি গাড়ি করে বিয়েবাড়িতে প্রবেশ ঘটল বর ও বরযাত্রীদের। বর দেখার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। বিয়েবাড়ির সামনে রাস্তায় লোকে লোকারণ্য। উৎসুক জনতার ঢল ও ভিড়ের বর্ণনা চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় ধরা পড়েছে এভাবে, 'বরের পাল্কী লইয়া অগ্রসর হওয়া সুকঠিন ব্যাপার হইয়া পড়িল। নূতন ব্যাপারের পথ প্রদর্শক হইতে গিয়া বরের সদাচিন্তিত ও চমকিত চিত্তে এই জনতাজাত যে আশঙ্কার উদয় হইতেছিল, রামগোপাল ঘোষ, হরচন্দ্র ঘোষ, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, দ্বারকানাথ মিত্র প্রভৃতি বিদ্যাসাগর-বন্ধুমমডলী বরের দক্ষিণে ও বামে পালকি ধরিয়া উৎসাহ ও আনন্দবর্দ্ধন করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছিলেন।' শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের কথায় 'এই জনতাজাত ঔৎসুক্যজনিত চাপকে সামাল দিতে বর আসার পথে সুকিয়া

স্ট্রিটে দুই হাত অন্তর পুলিশ পাহারা রাখা হয়।'

ঘটনাটি ঘটে উনিশশতকের মধ্যভাগে, যা উত্তর চব্বিশ পরগনা ও বাংলার সামাজিক ইতিহাসে এক চিরস্মরণীয় ঘটনা। ঘটনাটির পিছনে যে মানুষটির অক্লান্ত পরিশ্রম ও সংগ্রাম কাজ করেছে তিনি ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর স্বয়ং। ইংরেজ বাহাদুরের বদান্যতায় মোসাহেব নামে এক ধনাঢ্য সমাজ তখন সদ্য তৈরি হয়েছে। সাদা চামড়ার কলোনিয়াল সংস্কৃতির উত্তাপ সবেমাত্র মাখতে শুরু করেছে বাঙালি সমাজ। স্মার্ত স্বার্থ-টুলো পণ্ডিতরা শাস্ত্রচর্চা করে চলেছেন বহাল তবিয়তে। সেই সঙ্গে পরনিন্দা, পরচর্চাতে। এঁদের ক্ষুণ্নিবৃত্তি হতো ধনাঢ্যদের দ্বারাই। শাস্ত্রবিচার তাই ধনাঢ্য-বুদ্ধিমাফিক হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। সমাজে তখন কুলীনদের একচেটিয়া আধিপত্য ও প্রতিপত্তি। শিশু বিয়ে, বাল্যবিয়ে, বহুবিবাহের তখন রমরমা। চোখ-কান খোলা রাখলে আজও সমাজে বাল্যবিয়ে হতে দেখা যায়। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য। অনাচার সেদিনও ছিল, আজও আছে। এই ব্যাধি দূরীকরণে বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে? এই ধরনের অনাচার আইনে নিষিদ্ধ হলেও একবিংশ শতাব্দীতে ফেসবুকের দুনিয়ায় বাস করেও আজও মানুষের মন থেকে পুরোপুরি নির্মূল করা সম্ভব হয়নি। কর্তব্য ও অকর্তব্য বিষয় শাস্ত্রবচন অনুযায়ী সেকালেও নির্ধারিত হতো, একালেও নির্ধারিত হয়ে থাকে, বিধান এইসব অলস পণ্ডিতদের। কৌলিন্যপ্রথার কুফল — বহু নারীর অকাল বৈধব্য। এ সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা হয়েছে। ফলপ্রসু হতে পারেনি। তামাক শুধু পুড়েছে। দুই ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে ও নাক দিয়ে ধোঁয়া শুধু উড়েছে। সমস্যা আরও গভীরে গেছে। অনেক বিধবা-শিশুর করুণ নিশ্বাসে আকাশ-বাতাস গুমরে মরেছে। অনেক বাবা-মা যন্ত্রণায় বধির হয়েছেন। আবার সর্বস্বান্ত হয়েছেন। এ চিত্র শুধুমাত্র বাংলার নয়, এই চিত্র সমগ্র ভারতবর্ষের।

বাল্যবিহাহ, বহুবিবাহ ও কৌলিন্যপ্রথার অবিশম্ভাবী পরিণতি ছিল সমাজের বহু নারীর ভাগ্য অকাল বৈধব্য। আমাদের সমাজে এইসব কুপ্রথার ফল হয়েছিল মারাত্মক এবং ভয়াবহ। নারীজাতির সেদিনের ক্রন্দন, আর্তনাদ সমাজের কিছু মহৎ মানুষের, প্রতিষ্ঠানের ও সংস্থার হৃদয়কে, মননকে সজোরে নাড়া দেয়। তাঁদের চিন্তাভাবনা সমাজের সমষ্টিরূপে আলোড়ন সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়। রামমোহন, ডিরোজিও, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আত্মীয়সভা, নব্যবঙ্গ দল, তত্ত্ববোধিনী সভা, ব্রাহ্মসমাজের কার্যকলাপ ও ঘাত প্রতিঘাতে যে জীবন-আদর্শ, সংস্কার-আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে দাঁড়ায়। বিশিষ্ট সমাজচিন্তক, সমাজসংস্কারক,

চিন্তাশীল বিদ্যাসাগর তার সঙ্গে ওতপ্রোতবভে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এঁদের সঙ্গে তাঁর চিন্তাধারা মিশিয়ে বিধবা বিয়ের আন্দোলনকে কেন্দ্র করে আপোসহীন সংগ্রাম করেছেন, অনেক বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়ে তারই পরিণতি ১৮৫৬ সালের ১৬ই জুলাই বিধবা বিবাহ আইন পাস। রাজনারায়ণ বসুও ছিলেন বিদ্যাসাগরের এই বিধবা বিবাহ আন্দোলনের সহপথিক। রাজনারায়ণ বসু ছিলেন অধুনা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বোড়ালের মানুষ। শিবনাথ শাস্ত্রী জানিয়েছেঝন, '১৮৫৬ সাল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাল।' তাঁর সেই সর্বশ্রেষ্ঠকালের সঙ্গী ছিলেন রাজনারায়ণ। কেননা তিনি তাঁর দু'ভাইকে বালবিধবাদের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে সমাজে নজির সৃষ্টি করেন। রাজনারায়ণ কর্তৃক এই তৃতীয় ও চতুর্থ বিধবা বিয়ে বিদ্যাসাগর কর্তৃক প্রথম ও দ্বিতীয় বিধবা বিয়ে অপেক্ষা কম ঐতিহাসিক ঘটনা ছিল না। প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ বিধবা বিয়ের কৃতিত্বের অধিকারী কিন্তু উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা। এই সমাজসেবামূলক কাজ করতে গিয়ে বিদ্যাসাগর ও রাজনারায়ণ বসু দু'জনেই জীবননাশের ও অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হন।

এই ধরনের সামাজিক কাজকে আজকের প্রজন্ম মামলি মনে করতে পারেন। ইতিহাসের আদালতে তা কিন্তু আদৌ মামলি নয়। বর্তমান প্রজন্ম একবিংশ শতাব্দীর সুশীল সমাজে (সিভিল সোসাইটি) বাস করেও একজন বিধবাকে বিয়ে করার সৎসাহস দেখানো তো দূর অস্ত, ভাবনায় নিয়ে আসতে পারেন না। ওই যে, পাছে সমাজ কিছু বলে। সঙ্গে আছে আত্মীয়স্বজনদের ভ্রূকুটি, বাঁকাচোখ, ব্যঙ্গ, শ্লেষ ও তির্যক মন্তব্য। সূঁচের মতো গাঁথে। সম্পর্ক তুলে দেওয়া থেকে শুরু করে ঠারে-ঠোরে বুঝিয়ে দেয় এটা অসামাজিক কাজ। যতই সিভিল সোসাইটি গলা ফাটিয়ে বলুন আমরা সিভিল— সত্যি করে বলুন তো আদৌ কি সিভিল? গভীরে গিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে অনাচার আছে অনাচারের জায়গায়; কুকংস্কার আছে কুসংস্কারের জায়গায়। যদি কিছু ঘটে থাকে সেগুলি ব্যতিক্রমী ঘটনা। বুক দরাজ করে জোর গলায় বলা যাবে না বিধবা বিয়ে আজ সিভিল সোসাইটিতে সামাজিকভাবে স্বীকৃত। কথায় বলে ঠেলায় পড়ে বিড়াল গাছে ওঠে। আইনের ভয়ে বলা হয়ে থাকে বিধবা বিয়ে সমাজে সার্বিকভাবে স্বীকৃত। স্বতঃস্ফূর্তভবে বিধবা বিয়ে সমাজে কতটা স্বীকৃত, তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। মনে কোনও দ্বিধা দ্বন্দ্ব ও সংশয় না রেখে সমাজমন সোৎসাহতচিত্তে বিধবা বিয়ে স্বীকার করে নিযেছে এমনটা বলা সত্যের অপলাপ ভিন্ন আর কিছু নয়।

যতই সিভিল সোসাইটি বলে চিৎকার করা হোক না কেন— সমাজরন্ধ্রেই কুসংস্কারের ব্যাধি কিন্তু থেকেই গেছে। সমূলে উপড়ে ফেলা সম্ভব হয়নি। মানুষ সিভিল হয়েছেন, শিক্ষিত হয়েছেন, লব্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, নিজস্ব আইডেনটিটি বা সত্ত্বা তৈরি করেছেন, রুচি পাল্টেছেন, বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার করেছেন, মহাকাশ পাড়ি দিচ্ছেন, নদীগর্ভে টিউব রেল চালু করেছেন, ডিনামাইটের সাহায্যে পাহাড় ফাটিয়ে ফেলছেন, নদীর ঢেউ থমকে দিচ্ছেন। অথচ একজন বিধবার পুনর্বিবাহের সম্বন্ধ নিয় গেলে সেই সিভিল সোসাইটির আপডেটেড মানুষ সহস্র যোজন দূরে পালিয়ে যাচ্ছে। হায় রে সমাজ! হায় রে সিভিল সোসাইটি! তোমার তুলনা হয় না।

ইতিহাসে ফেরা যাক। বিধবা বিয়ে ও বিদ্যাসাগর অনুষঙ্গে রাজনারায়ণ বসু প্রসঙ্গে। রাজনারায়ণের জন্মভূমি ছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনার বোড়াল। আর কর্মভূমি ছিল মেদিনীপুর। বিদ্যাসাগরের জন্মভূমি ছিল পশ্চিম মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রাম, কর্মভূমি ছিল কলকাতা। কিছুটা সময় উত্তর ২৪ পরগনাতে, তাও আবার বারাসত সহ অন্যান্য অঞ্চলে। দুই ব্যক্তিত্বকে নিয়ে ভাবলে জানার আগ্রহ বাড়ে বইকি। বিধবা বিয়েকে কেন্দ্র করে কর্মভূমি মেদিনীপুরে রাজনারায়ণ যেমন রক্ষণশীল সমাজপতিদের বিষ নজরে পড়েছিলেন, তেমনই পড়েছিলেন আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীদেরও রোষানলে। রাজনারায়ণ বসুর নিজস্ব জবানবন্দিতে তা ধরা পড়েছে ভারী চমৎকাররূপে। বক্তব্যটি দীর্ঘ হলেও বর্তমান প্রবন্ধের প্রয়োজনে এখানে উদ্ধৃতিযোগ্য—

"তৃতীয় বিধবাবিবাহ ও চতুর্থ বিধবা বিবাহ আমার জেঠ্‌তুতো ভাই দুর্গানারায়ণ বসু ও আমার সহোদর মদনমোহন বসু করেন। এই বিধবাবিবাহ দেওয়াতে আমার খুড়া মহাশয় বোড়াল হইতে আমাকে লেখেন যে তোমার দ্বারা আমরা কায়স্থকুল হইতে বহিষ্কৃত হইলাম। দুর্গানারায়ণ বসু যখন বিধবাবিবাহ করিতে যাইতেছিলেন তখন গ্রামের ঈশ্বরচন্দ্র মুখুয্যে তাঁহার পালকির ভিতর মুখ দিয়া বলিলেন, 'দুর্গা তোর মনে এই ছিল, একেবারে মজালি।' মেদিনীপুরেও কম আন্দোলন হয় নাই। মেদিনীপুরের তদানীন্তন গবর্নমেন্ট উকিল হরনারায়ণ দত্ত বলিয়াছিলেন যে, 'রাজনারায়ণবাবু জানেন যে তিনি বাঙ্গালা ঘরে বাস করেন।' ইহার অর্থ এই যে যখন তিনি বাঙ্গালা ঘরে বাস করেন তখন আমরা তাহা অনায়াসে পুড়াইয়া দিতে পারি।

... বোড়ালের লোক বলিয়াছিল, 'রাজনারায়ণ বসু গ্রামে আইলে আমরা ইট

মারিব।' তাহাতে আমি বলিয়াছিলাম, 'তাহা হইলে আমি খুশি হইব, আমি বাঙালিকে উদাসীন জাতি বলিয়া জানি। এই রূপ ঘটনা হইলে আমি স্থির করিব যে এক্ষণে তাঁহাদিগের বিধবাবিবাহের প্রতি বিদ্বেষ যেমন প্রবল, তেমনই বিধবাবিবাহ যখন ভাল মনে করিবেন তখন উহার প্রতি তাঁহাদিগের অনুরাগ এইরূপ প্রবল হইবে।'

... মাতাঠাকুরানি তিনি বলিলেন যে, 'রাজনারায়ণ তোর মনে এই ছিল'; এই বলিয়া অনুযোগ করিতে লাগিলেন। এই সময় আমার মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল তাহা পাঠকবর্গ অনায়াসে বুঝিতে পারেন। এই বিধবাবিবাহের জন্য মাতাঠাকুরানি ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছিলেন। বিধবাবিবাহ সময়ে তিনি মথুরায় ছিলেন। তিনি সেই সময় বাটিতে থাকিলে আমরা দুই ভাইয়ের বিধবাবিবাহ দিতে পারিতাম না।"

রাজনারায়ণ যখন তাঁর সহোদর ও জেঠ্‌তুতো দু'ভাইকে বিধবাদের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে বদ্ধ সমাজকে ভাঙছেন এবং নতুন সমাজ গড়ছেন তখন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রাজনারায়ণকে লিখেছিলেন, 'এই বিধবাবিবাহ হইতে যে গরল উত্থিত হইবে তাহা তোমার কোমল মনকে অস্থির করিয়া ফেলিবে, কিন্তু সাধু যাহার ইচ্ছা ঈশ্বর তাহার সহায়।' বিনয় ঘোষ জানিয়েছেন, 'দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঈশ্বর বলতে জগদীশ্বরের কথাই বলেছেন।' বিধবা বিয়ের সাধুসংকল্প তখন যাঁরাই গ্রহণ করেছিলেন, ঈশ্বরচন্দ্র তাঁদেরই সহায় হয়েছেন। রাজনারায়ণ বসুর বিধবা বিয়ের উদ্‌যোগ দেখে বিদ্যাসাগর তাঁকে লিখেছিলেন, 'আপনি অসাধারণ সাহসপূর্বক বিধবাবিবাহের মঙ্গলার্থে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ... আপনাকে স্মরণ হইলেই শত শত সাধুবাদ প্রদান করিয়া থাকি, বস্তুতঃ আপনি অতি মহাত্মার কর্ম করিয়াছেন। এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া নানাপ্রকারে আপনার মনে যেরূপ ক্লেশ হইতেছে বোধহয় কাহাকেও সেরূপ ক্লেশ পাইতে হইতেছে না।' প্রাপ্ত তত্যে দেখা গেছে প্যারীচরণ সরকার উত্তর ২৪ পরগনার বারাসতে আসার পর সেখানে বিদ্যাসাগর কোনও কোনও রবিবার করে সেখানে আসতেন। কখনও পালকি চড়ে, কখনও বা ঘোড়ায় টানা ছ্যাকরা গাড়ি করে। প্যারীচরণ সরকার স্থানীয় প্রগতিশীলদের সঙ্গে বারাসত, বাদু, মহেশ্বরপুর, গস্তিয়া, দত্তপুকুর প্রভৃতি গ্রাম জনপদে বিধবা বিয়ে প্রবর্তনে উদ্যোগী হন। প্যারীচরণ সরকারের ন্যায় খাঁটুরা গ্রামও বিধবা বিয়ের সমর্থনে এগিয়ে আসে। ঘটনাক্রমে উত্তর ২৪ পরগনার খাঁটুরা গ্রামের যুবকই ছিলেন ভারতবর্ষে প্রথম বিধবা বিয়ের নায়ক। সেই ঘটনায় ফেরা যাক।

বিধবা বিয়ের স্বপক্ষে আইন তো পাস হলো। এবার বাস্তবে রূপায়ণের সমস্যা। ক্ষেত্র বোধহয় প্রস্তুত হয়েই ছিঠল। লক্ষ্মীমণি স্বামী হারা। তাঁর মেয়েও বালবিধবা। একমাত্র মেয়ে। মেয়ের দুঃখ যন্ত্রণায় মা কাতর। মেয়ের চিন্তাতে মা বিভোর। কন্যা কালীমতীর চিন্তায় তাঁর মা আর নিজেকে সামলাতে পারে না। হাজার হোক তিনি তো গর্ভধারিণী মা। একরত্তি মেয়ের ভবিষ্যৎ ভেবে মা ডুকরে ডুকরে কেঁদে ওঠেন। তাঁর দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। এতো কিছুর মধ্যে লক্ষ্মীমণি বিধবা বিয়ের আন্দোলনের খবরও রাখেন। তিনি মনে মনে ঠিক করেন এই আন্দোলন সফল হলে তিনি আবার কালীমতির বিয়ে দেবেন। লক্ষ্মীমণি যখন এমনই ভাবছেন, সেই সময় মদনমোহন তর্কালঙ্কার মুর্শিদাবাদের জজপণ্ডিতের কাজ ছেড়ে দেন। তাঁরই পদে সদ্য যোগ দিয়েছিলেন খাঁটুরা গ্রামের ছেলে শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। দুই মনীষীর মধ্যে সৌহার্দ্য ছিল অসাধারণ। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের শ্বশুরবাড়িতে লক্ষ্মীমণির অবারিত যাতায়াত। সেই সুবাদে কন্যাপক্ষের বিস্তারিত খবরাখবর সবই জানা ছিল মদনমোহনের। একদিকে কন্যা বিধবা, অন্যদিকে বিদ্যারত্ন মশাইও বিপত্নীক। উভয়ের বিয়ের যোগসূত্র হলেন মদনমোহন তর্কালঙ্কার স্বয়ং। লক্ষ্মীমণির এবং তাঁর মেয়ে কালীমতির সকরুণ অবস্থা মদনমোহনের শ্বশুর পরিবার ভালোভাবেই জ্ঞাত ছিলেন। শ্বশুর ও শাশুড়ি তাঁদের জামাইকে মা ও মেয়ের অবস্থা এবং বিয়ের ব্যাপারে তাঁদের ইচ্ছা জানিয়েছেন। গুরুজনদের কথা ও অনুরোধ জামাই মদনমোহন ফেলে দিতে পারেননি। সেই মতো মদনমোহন তর্কালঙ্কার বিধবা বিয়ের সমর্থক রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। সমস্ত ঘটনার আদ্যপান্ত তিনি তাঁকে ব্যক্ত করেন। পাত্র হলেন উত্তর ২৪ পরগনার খাঁটুরার শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। পাত্রী হলেন কালীমতী দেবী। উবয়ের পরিচয় এই প্রবন্ধের শুরুতেই উল্লেখিত হয়েছে। কালীমতীর প্রথম বিয়ে হয় নদিয়া জেলার বহির্গাদি গ্রামের হরমোহন ভট্টাচার্যের সঙ্গে। মাত্র ৪ বছর বয়সে। বিয়ের ২ বছর পর মাত্র ৬ বছর বয়সে কালীমতি বিধবা হন। ৪ বছর বিধবাজীবন কাটাবার পর কালীমতি আবার বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন। তখন তাঁর বয়স ১০ বছর।

বিয়ের স্থান ও তারিখ ঠিক হলো। এই প্রথম বিধবা বিয়ে অনুষ্ঠিত হবে কলকাতার সুকিয়া স্ট্রিটে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে। ১০ই অগ্রহায়ণ তাঁদের বিয়ের দিন নির্ধারিত হয়। তবুও এই বিয়ে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হতে পারেনি। কথায় বলে বিধি বাম। নিয়তি বাধ সাধলো। এতো উদ্যোগ, এত আয়োজন

সবকিছুই ঠিকঠাক থাকা সত্ত্বেও বিয়ের আগেই পাত্র বেঁকে বসলেন। তিনি জানান বিশেষ কারণে এই বিয়ে করতে পারবেন না। সূত্রে প্রাপ্ত তাঁর এই অসম্মতির সম্ভবত দু'টি কারণ ছিল। কৌলিন্যপ্রথার মোহ এবং তদানীন্তন রক্ষণশীল সমাজপতিদের রক্তচক্ষু। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেসময় 'কস্যচিৎ যথার্থ বাদিন' শিরোনামে এক চিঠি প্রকাশিত হয়। তাও আবার ছদ্মনামে। ছদ্মনামে লেখা এই চিঠির কিয়দংশে তার প্রমাণ মেলে।

'কস্যাচিৎ যথার্থ বাদিন'

"... যতদিন বিধবা বিবাহ না হইয়াছে ততদিন সামান্য লোকে এমত বলিতেছিল শ্রীশবাবু অতি সুপণ্ডিত ও বিষয়াপন্ন, তাঁহার কিছুরই অভাব নাই তিনি কি দুঃখে এমত হেয় কর্মে প্রবৃত্ত হইবেন, পক্ষান্তরে ভদ্রসমাজে বিবেচনা করিয়াছেন শ্রীশবাবু কখন প্রতিজ্ঞারুঢ় হইয়াছেন তখন করিলেও করিতে পারেন কিন্তু তাঁহাকে অবশ্যই এক ঘরীয়া হইয়া থাকিতে হইবেক, ভদ্র সন্তানমাত্র তাঁহার সহিত আহারাদি করিবেন না বোধহয়। এরূপ উদ্বেগে পড়িয়াছিলেন এ বিবাহে প্রথমতঃ অধিক ভদ্রসন্তান আসেন কিনা।' শ্রীশচন্দ্রের মাও এই বিয়ে মেনে নিতে পারেনি। ১৮৫৬-র ২৭ নভেম্বর তারিখে 'ইংলিশম্যান' ও 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রিকার সংবাদে প্রকাশ, পাত্র শ্রীশচন্দ্র, তাঁর মা সূর্যমণির বিরোধিতা ও সামাজিক অত্যাচারের কথা চিন্তা করে বিয়েতে অসম্মত হন। সংবাদে প্রকাশ 'শ্রীশ ভট্টাচার্যের মাতাঠাকুরানী ছুরি হস্তে করিয়া বসিলেন যদি শ্রীশচন্দ্র বিধবা বিবাহ করে তবে গলদেশে ছুরি দিয়া প্রাণত্যাগ করিবেন।'

ইতিমধ্যে এই মুখরোচক খবরটি চারদিকে চাউর হয়ে যায়। মেয়ের মাও নাছোড়বান্দা। তিনিও বিয়ে দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। শ্রীশচন্দ্রের অসম্মতির কথা শুনে পাত্রীপক্ষ আদালতের দ্বারস্থ হন। তথ্যে প্রকাশ লক্ষ্মীমণি চল্লিশ হাজার টাকার ক্ষতিপূরণ দাবি করেন। এ কারণে বিয়েটি অগ্রহায়ণের ১০ বা ১৫ তারিখে সংঘটিত হয়নি। শ্রীশচন্দ্রের এই দুর্বলতাকে ব্যঙ্গ করে সেদিন ইংলিশম্যান ও সম্বাদ ভাস্কর লেখে, "... বড় বড় বানরের বড় দুই পেট, লঙ্কায় যাইতে মাথা করে হেট।' হিন্দুকলেজীয় নবীন-প্রবীণ ছাত্রমাত্র কেহ বাগ্‌দরিদ্র না হন বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গে পঞ্চমুখের বক্তৃতা করেন; তাহাতে জ্ঞান হয় যেন বৈধব্যদশায় আপনারাই যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন কিন্তু কার্যকালে সে সকল স্মরণ থাকে না। শ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য বিধবা বিবাহ বিষয়ে বাক্য দ্বারা সাহায্য করিতে ত্রুটি করেন নাই, পরে যখন সময় উপস্থিত হইল, তখন পরাঙ্‌মুখ হইয়া কহিলেন, 'বিবাহ

করিতে পারিব্ না'... ভট্টাচার্য পলায়ন করিলেন আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি... তাঁহার কথায় কে বিশ্বাস করিবে।' বিধবা বিবাহের সমর্থক গৌরীশংকর ভট্টাচার্য এই ঘটনার প্রেক্ষিতে আরও কড়া ভাষায় বিদ্রূপাত্মক আক্রমণ চালান। তিনি সম্পাদকীয় চাবুক মারলেন এভাবে---

"... এক কুলবালাকে নানা প্রকারে আশ্বাস দিয়া জ্ঞাতি-কুটুম্বাদির মধ্য হইতে বাহির করিয়া লইয়া আসিলেন এই ক্ষণে আর সে কুলবালা কোনও কুলে যাইতে পারিবেন না, তবে তাঁহার জীবন রক্ষার উপায় কী? অতএব যদি ওই রমণী রাজবিচারে অভিযোগ করিয়া থাকেন তবে উত্তম কর্ম করিয়াছেন। শ্রীশচন্দ্র তাঁহাকে চল্লিশ সহস্র টাকা দিয়া কর্ণদ্বয়ে হস্তস্পর্শপূর্ব্বক প্রকাশ করুন কুকর্ম করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে কেবল শ্রীশচন্দ্র আপনি কৃতঘ্ন হইলেন এমনত নহে, বান্ধবগণকেও লজ্জা দিলেন, ... এবং যে সকল বিধবার অভিলাষ ছিল বিবাহ করিবেন এইক্ষণে তাঁহারাও ভীত হইবেন। নানা ইতিহাসে লেখেন পুরুষেরা প্রেম রক্ষা করিতে পারেন না অতএব প্রীতি বিষয়ে পুরুষজাতি যে বিশ্বাসঘাতী তাহাও প্রতিপন্ন হইল। এইক্ষণেই হউক বা একশত বৎসর পরেই হউক হিন্দু বিধবাদিগের বিবাহ চলিত হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইতিহাসে লিখিত থাকিবে বিধবা বিবাহের উদ্যম সময়ে শ্রীশচন্দ্র নামা কোনও কৃতঘ্ন এরূপে উদ্যমভঙ্গ করিয়াছিলেন? দেখা যাইবে শ্রীশচন্দ্র সুপ্রিম কোর্টে কী উত্তর দিয়া বাদিনীর কৌশুলিগণকে নিরুত্তর করেন, সুপ্রিম কোর্টে এই এক নূতন মোকদ্দমা হইবে আমরাও শুনিতে যাইব শ্রীশচন্দ্র কি উত্তর করেন।"

অন্যদিকে সম্বাদ ভাস্করের সম্পাদকীয় থেকে জানা যায় শ্রীশচন্দ্রের মা হাতে ছুরি নিয়ে বসেছিলেন। তিনি রক্ষণশীলদের প্ররোচনায় বদ্ধ উন্মাদের মতো আচরণ করতে থাকেন। খাওয়া নাওয়া ত্যাগ করেন। একবস্ত্রে মাটিতে ও ধুলায় গড়াগড়ি করতে থাকেন। মাঝেমধ্যে নিজের বুক ও কপাল চাপড়াতে থাকেন। হায় হায় আমার সব গেলো বলে বিলাপ করতে করতে কান্নায় ভেঙে পড়েন। নিজের মাথায় কেশ ছিঁড়তে থাকেন, সেদিন তাঁকে সামলাতে বাড়ির লোকজনকে বেশ বেগ পেতে হয়। বাড়ির সদর দরজাতে পাড়াপড়শিরা সে দৃশ্য দেখার জন্য কৌতূহলবশত ভিড় জমাতে থাকেন। বর্ধিষ্ণু অথচ প্রাচীন গ্রামজনপদ খাঁটুরাতে জোর গুঞ্জন শুরু হয়। এই গুঞ্জন কেবল খাঁটুয়া গ্রামে সীমাবদ্ধ ছিল না, সমগ্র বাংলা কথা ভারতবর্ষকে হিন্দোলিত করে। বিলাপের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মা বলতে থাকেন শ্রীশ যদি ওই বিধবাকে বিয়ে করে আমি এই ছুরি দিয়ে আত্মহত্যা করবো।

যাই হোক অনেক জল ঘোলার পর শ্রীশচন্দ্র মাকে শান্ত করে সবকুল সামলে প্রথম বিধবা বিয়েতে রাজি হন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সর্বোপরি সমাজের মুখ রক্ষা হয়। বিহারীলাল সরকার 'বিদ্যাসাগর' জীবনীগ্রন্থে এই বিধবা বিয়ের বর্ণনা চমৎকার ভাবে পরিবেশন করেছেন। বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক হলো। বিয়ে সম্পন্ন হয় ২৩ অগ্রহায়ণ ১২৬৩ সাল, ইংরেজি ৭ ডিসেম্বর, ১৮৫৬ সাল, রবিবার। বিদ্যাসাগর সহ বিধবা বিয়ের সমর্থনকারীরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়েন।

বিয়ের আগে পাত্রীপক্ষ কলকাতায় সুকিয়া স্ট্রিটে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে, আর পাত্রপক্ষ এসে বিদ্যাসাগরের প্রিয় বন্ধু রামগোপাল ঘোষের বাড়িতে ওঠেন। রাত্রি ১১টার সময় বিয়ে শুরু হয়। বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রী মিলিয়ে প্রায় দু'হাজার লোকের সমাগম হয়। কারণ এ বিয়ে তো আর পাঁচটা বিয়ের মতো ছিল না। রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে বিয়ে সম্পন্ন হয়। বিয়েতে তখনকার দিনে খরচ হয় দশ হাজার টাকা। বিদ্যাসাগর মহাশয় একাই সে খরচ বহন করেছিলেন। প্রাচীনপন্থী গোঁড়া হিন্দু সমাজ ও হিন্দুদের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে এই প্রথম কোনও আবীরা বিধবার গলায় মালা পরিয়ে ইতিহাসের নায়ক হয়ে ওঠেন বর্তমান উত্তর ২৪ পরগনার খাঁটুরাগ্রামের ভঙ্গকুলীন শাণ্ডিল্য বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের সন্তান শ্রীশচন্দ্র। শ্রীশচন্দ্র ও বিদ্যাসাগরের সম্পর্ক কেবলই ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না— ছিল উভয়ের মধ্যে চরম বন্ধুত্ব ও আন্তরিকতার সম্পর্ক। ভগবানচন্দ্র বিদ্যালঙ্কারের কাছে চতুষ্পাঠীতে পাঠ শেষে বিদ্যারত্ন মহাশয় সংস্কৃত কলেজে পড়াশুনো করেন। পরে এই কলেজেই সহসম্পাদক পদে আসীন হয়েছিলেন। শ্রীশচন্দ্রের পিছিয়ে যাওয়ার ফলে বিদ্যাসাগরের মনোঃপীড়া পাওয়াটা তাই স্বাভাবিক। এক অর্থে এই বিয়েটা ছিল উনিশ শতকের রক্ষণশীল সমাজকে ভেঙে চুরমার করে দেবার জন্য প্রথম ঐতিহাসিক বিধবা বিয়ে। শ্রীশচন্দ্র বিয়েটা করায় সম্বাদ ভাস্করের গৌরীশংকরও আশ্বস্ত ও খুশি হয়েছিলেন। আর খুশি হওয়ারই কথা। এমন কাজ সত্যিই তো পথপ্রদর্শকের কাজ। নজির সৃষ্টিকারী কাজ। গৌরীশংকর প্রশস্তি করে সম্পাদকীয়তে লিখেছিলেন—

"চন্দ্রের কলঙ্ক আছে কিন্তু বিদ্যারত্নর কোনও কলঙ্ক নেই। অতি ভদ্রকুলে তাঁর জন্ম। ৭/৮ শত ভদ্র ব্রাহ্মণ তাঁর বাড়িতে অন্নভোজন করেন। পিতা এ দেশের অদ্বিতীয় কথকতা ব্যবসায়ী — রামধন তর্কবাগীশ। সংস্কৃত কলেজে প্রচলিত প্রায় সর্বশাস্ত্রই অধ্যয়ন করেছেন, কন্যার পরিচয় দিয়ে বলেছেন তিনি

সদবংশজাত। মাতা প্রাণাধিক কন্যার বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে কলকাতায় এনে 'শ্রীশচন্দ্র বরে' কন্যা সম্প্রদান করলেন।" বিয়ের আগের দিন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের বিস্তার চলিত-পত্র দেওয়া হয়েছিল। বিয়ের দিন তা সম্ভব হয়নি। নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাঁর কাগজে সংবাদ পরিবেশন করে বলেছেন, "এই বিবাহে ন্যূনাধিক আটশত নিমন্ত্রণের পত্র মুদ্রিত হয়, তদ্ভিন্ন অধ্যাপক ভট্টাচার্যদিগের নিমন্ত্রণের জন্য কতকগুলি পত্র পৃথকরূপে সংস্কৃত কবিতায় মুদ্রিত হইয়াছিল।"

নিমন্ত্রণ পত্রে কীভাবে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল সে বিষয়ে দু-এক কথা এখানে উল্লেখিত হলো—

নিমন্ত্রণলিপি দু'টির বয়ান ছির এই রকম:

শ্রীলক্ষ্মীমণি দেব্যাঃ সবিনং নিবেদনং। ২৩ অগ্রহায়ণ রবিবার আমার বিধবা কন্যার শুভবিবাহ হইবেক। মহাশয়েরা অনুগ্রহপূর্ব্বক কলিকাতার অন্তঃপাতী সিমুলিয়ার সুকিয়া স্ট্রিটের ১২ সংখ্যক ভবনে শুভাগমন করিয়া শুভকর্ম সম্পন্ন করিবেন, পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম ইতি। তারিখ ২১ অগ্রহায়ণ শকাব্দ: ১৭৭৮।

এ পত্রটি সর্বসাধারণের জন্য আর ভট্টাচার্য পণ্ডিতদের জন্য:

অন্ত্যে ভৌমে নিশান্তে বিলসিত নিতরাম পদ্মিনীপ্রাণকান্তে সহাকান্তে ক্ষণাংশে দিনীকরণদিনে শাস্ত্রীমার্গানুসারী, ভূয়োভাবী বিধানাৎ পরিণয়নবিধি ভর্ত্তৃহীনাত্মাজায়াঃ। পুর্য্যোবর্য্যার্য্যবিজ্ঞৈরিহ সদসি গতৈর্ম্মৎ কৃপাপারতন্ত্র্যাৎ।।

মজার ঘটনা হলো এই বিয়েতে উপস্থিত ব্যক্তিদের নাম সকল লিখে রাখা হয়। আগেই বলেছি বরযাত্রী, কন্যাযাত্রী মিলিয়ে প্রায় দু'হাজার লোকের সমাগম হয়। বিয়েতে শাস্ত্র বিধি ও স্ত্রী আচার মেনেই সম্পন্ন হয়। ভূয়যী প্রশংসা করে পাত্রপাত্রী পক্ষের বংশ পরিচয় উল্লেখ করে। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়' সংবাদ পরিবেশন করা হয়। সেই সংবাদের কিয়দংশ এখানে তুলে দিচ্ছি— "ইহার মাতা লক্ষ্মীমণি দেবী হিন্দু শাস্ত্রানুসারে ও দেশপ্রচলিত ব্যবহার অনুযায়ী উল্লিখিত পাত্রে ইহাকে সম্প্রদান করেন। ব্রাহ্মণবর্ণের বিবাহ উপলক্ষ্যে এদেশে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ ও কুশণ্ডিকাদি যে যে ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে এ বিবাহে সে সমস্ত হইয়াছিল, তাহার কোনও প্রকার অনুষ্ঠানের ত্রুটি হয় নাই।" তবে মেয়ের মা লক্ষ্মীমণির মনের ইচ্ছা ছিল, "যদি মধ্যে গোলমাল না হইত তবে সপ্তাহ পূর্ব্বাবধি নৃত্যগীত, বাজী ইত্যাদির আমোদাদিও হইতে পারিত।"

৭ ডিসেম্বর রাত্রি ১১টার সময় যখন বিয়ে আরম্ভ হয় তার বর্ণনা বিভিন্ন

কাগজে ও সংবাদপত্রে বিশদে প্রকাশিত হয়। সংবাদে লেখা হয়, বিয়েতে মহাসমারোহ হয়েছিল। শুভ অনুষ্ঠানকালে সমকালীন কলকাতার প্রায় সকল প্রধান প্রধান ভদ্রজন উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে— বিয়েতে খাটাখাটনি করেছেন। বিপুল লোকসমাগম হওয়ায় অনেককে বসতে জায়গা পর্যন্ত দেওয়া যায়নি। হিন্দুশাস্ত্র ব্যবসায়ী অনেক ব্রাহ্মণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে শুভকর্ম সম্পন্ন করেছিলেন। প্রভাকর লেখে, 'বিবাহ সময়ে বরবাহাদুর আসনোপবিষ্ট হইলে উভয় পক্ষের পুরোহিতরা বিবাহ মন্ত্র পাঠ করেন, তাহার কিছু রূপান্তর করেন নাই, লক্ষ্মীমণি কন্যা দান করেন, দান সামগ্রী অলঙ্কার সকলই ছিল, পরে বর স্ত্রী-আচারস্থলে গমনকালে এদেশের প্রচলিত প্রথানুসারে 'দ্বারষষ্টি ঝাঁটাকে প্রণাম করেন ও স্ত্রী আচারস্থলে উলুধ্বনি, নাকমলা, কানমলা ও কড়ি দে কিনলেম, দড়ি দে বাঁদলেম, হাতে দিলাম মাকু একবার ভ্যা করোতো বাপু; রমণীগণের একান্ত প্রার্থনায় বরবাহাদুর ভ্যাও করিয়াছিলেন।" রাজনারায়ণ বসু এই বিয়েকে যুগ ওল্টানোর জন্য ভয়ানক ঘটনা বলে অভিহিত করেছিলেন। বিয়েতে এসেছিলেন রাজা রামমোহন পুত্র রমাপ্রসাদ রায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, রামগোপাল ঘোষ, রাজা দিগম্বর মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, জজ হরচন্দ্র ঘোষ, হাইকোর্টের শম্ভুনাথ পণ্ডিত, দ্বারকানাথ মিত্র, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক মণ্ডলী সহ সেকালের কৃতী মানুষজন। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'মেন আই হ্যাভ সিন' গ্রন্থে লিখেছেন— 'সেদিনের কথা আমি কখনও ভুলবো না। যখন বিদ্যাসাগর মহাশয় শোভাযাত্রা করে তাঁর বন্ধু অর্থাৎ বরকে (শ্রীশচন্দ্রকে) নিয়ে উপস্থিত হলেন তখন লোকের এত ভিড় হয়েছিল যে রাস্তায় এক ইঞ্চি জায়গা ছিল না এবং অনেকে রাস্তার ধারে নর্দমার মধ্যে পড়ে গিয়েছিল।'

প্রথম বিধবা বিয়েকে কেন্দ্র করে সেসময় দু'টি পরস্পর বিবাদমান শিবির গড়ে ওঠে। প্রতিপক্ষ সংবাদ প্রভাকর বিয়ের বিবরণ দিতে গিয়ে লেখেন— "... অনেক লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে বিদ্যালয়ে বালক ও কৌতুকাদর্শি লোকসংখ্যাই অধিক বলিতে হইবেক, রঙ্গতৎপর লোক সমারোহে রাজপথ আচ্ছন্ন হইয়াছিল, সাহেবরা পাহারাওয়ালা লইয়া জনতা নিবারণ করেন, রাত্রি অনুমান ১১ ঘটিকাকালে বরবাহাদুর শকটারোহণে সমাগত হইয়া সভাস্থ হইলে সমাদরপূর্ব্বক তাহাকে গ্রহণ করেন, দুই এক টাকা বিদায় পাইবার প্রত্যাশাপন্ন হইয়া প্রায় শতাধিক লোক লাল বনতাবৃত ভট্টাচার্য্য ও রামগতি প্রভৃতি কয়েকজন ঘটক ও পঞ্চুভাট প্রভৃতি কয়েকজন ভাট উপস্থিত থাকিয়া

গোল করিয়া হাট বসাইয়াছিল, অনুষ্ঠানের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই।" তীক্ষ্ণ কটাক্ষে আরও মন্তব্য, "পাঠকগণ! আমরা পূর্বেই লিখিয়াছি এবং এক্ষণেও লিখিতেছি যে হিন্দুর বিধবার এই প্রথম বিবাহ কোনওক্রমেই সর্বাঙ্গ সুন্দর রূপে বাচ্য হইতে পারে না, যেহেতু বিবাহস্থলে দম্পতির পরিবার বা জ্ঞাতিকুটুম্ব কেহই উপস্থিত হয় নাই এবং কন্যার খুড়া কিম্বা ভ্রাতা ইত্যাদি কেহই তাঁহাকে পাত্রস্থ করেন নাই, তাহার জননী চক্রাকার রূপচাঁদের মোহনমন্ত্রে মুগ্ধা হইয়া তাঁহাকে সম্প্রদান করিয়াছেন, বরপাত্রও কেবলমাত্র রাজদ্বারে প্রিয়পাত্র হইবার প্রত্যাশায় এতদ্রূপে ত্রিকুল পবিত্র করিলেন...।" গোপীমোহন মিত্র তাঁর একটি পত্রে এই বিয়ের তীব্র সমালোচনা করেছেন। এ বক্তব্য তাঁর একার নয়। এ বক্তব্য সমকালীন একশ্রেণির রক্ষণশীলদের বক্তব্য। তিনি তঁদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য এ ধরনের শ্লেষাত্মক চিঠি লেখেন— পাত্রীর শ্বশুরকুল বা পিতৃকুল বা মাতৃকুল মধ্যে যে সম্প্রদান করেন কৌতূকবোধে ভদ্র হিন্দুরা এই সব রঙ্গ দেখতে ভিড় জমিয়েছিলেন। দু'হাজার লোকের সমাগম স্বীকার করে নিয়ে বলা হযেছে সমবেত জনতার মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন অনিয়মিত বঙ্গদর্শক, এঁরা কেউ সেখানে পাত পেতে খাননি। বিধবা বিয়ে বৈধ বলে নাম স্বাক্ষরও করেননি। এই সব রঙ্গদর্শকদের স্বপক্ষে বলা হয়েছে ইংরেজদের বিয়ে বা সমাধি দেখতে অথবা কসাই তোলায় গোহত্যা দেখতে অনেক সম্ভ্রান্ত হিন্দুগণ যান "তন্নিমিত্ত তাহাদিগের কোনো দোষ আইসে না এক্ষণে আমি গৌরীশংকর ভট্টাচার্য মহাশয়কে বিনয়াবচনে জিজ্ঞাসা করি গত রবিবাসরীয় নিশাতে শ্রীশচন্দ্রের বিবাহ অনিশ্চিত থাকাতে আগে দুই তিন বর বিবাহস্থলে উপস্থিত ছিল কি?" আসলে পত্রলেখকের মনোভাব নিঃসন্দেহে রক্ষণশীল মানসিকতা ছাড়া আর কিছুই ন য়। বিজাতীয় বিয়ে বা কসাইতোলায় গোহত্যা দর্শনে ভদ্রহিন্দুরা সমাজচ্যুত হন না, অথচ যত দোষ বিধবা বিয়ের বেলায়। কি হাস্যকর যুক্তি তাই না। চিঠিকার সম্ভবত ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি পরের মুখে ঝাল খেয়েছেন। চিঠিকার শ্রীশচন্দ্র সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে আরও তিনজন বরের কথা জানতে চেয়েছেন। এই ঘটনা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় তিনি ঘটনাস্থলে না গিয়ে চিঠির মাধ্যমে রক্ষণশীলদের তল্পিবাহকেরই কাজ করেছেন।

গৌরীশংকর ভট্টাচার্যও ছাড়ার পাত্র নন। কট্টর শাস্ত্রীয়দের চরিত্র তাঁর ছিল নখদর্পণে। তিনি বিয়েবাড়িতে উপস্থিত সকলের নামধাম সবই তিনি নিজের কাছে জোগাড় করে রেখেছিলেন। খোলাখুলিভাবেই আহ্বান জানিয়েছেন তিনি

যে এই বিয়েতে তার উপস্থিতি অস্বীকার করবেন তাকে দেখিয়ে দেওয়া হবে— কে, কার পুত্র, কার পৌত্র, কার ভাগ্নে গিয়েছেন এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা সভায় গিয়ে বিদায়কড়ি নিয়ে এসেছেন। লক্ষ্মীমণির অন্তঃপুরে প্রায় ২০০ ভদ্র স্ত্রীলোক ওই দিন বিয়ে অনুষ্ঠানে যোগদান করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে বরকন্যাকে যৌতুকও দান করেছেন — এ তথ্য সমকালীন সম্বাদ ভাস্করের পাতায় জ্বলজ্বল করছে। বর্ধমানের মহারাজা প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারেননি। প্রথম বিধবা বিয়ের কথা। তাই তিনি তদানীন্তন বাঙালি চরিত্রের পরিচয় দিয়ে বলেছেন, 'এতদ্দেদশীয় লোকেরা মৌখিকাড়ম্বরে দরিদ্র নহেন, কার্যকালে সে আড়ম্বর অম্বরাশ্রয়ে লজ্জা সম্বরণ করে।' তাই তাঁর অভিলায, ''উৎসাহ প্রদানাথ শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নকে এক রৌপ্য থালা এবং বেশ নামক এক রৌপ্যপাত্র যৌতুক দিব, রৌপ্য থালার উপরে বেশ পাত্র রক্ষিত হইবে, থালে এবং বেশ পাত্রের চতুর্দিগে এইরূপ বিতরণ লেখা থাকিবে এতকালের পরে শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন হিন্দু বিধবা বিবাহের পুনর্জন্মের জন্মদাতা হইলেন।''

এই বিয়েকে কেন্দ্র করে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের শ্বশুরকুল বিপদের সম্মুখীন হন। কি ভয়ঙ্কর ছিল সেদিনের রক্ষণশীল সমাজ। মদনমোহনের এক চিঠি সেই ঘটনার জ্বলন্ত প্রমাণ। পত্রটিতে লেখা ছিল— 'ভ্রাতঃ! লক্ষ্মীমণির বিধবা কন্যার বিবাহে আমার শ্বশ্রুঠাকুরানি ঘটকতা করিয়াছিল এই অভিযোগ দিয়া বাহিরগাদি ধর্ম্মাদহ প্রভৃতিগ্রামের লোকেরা ইঁহাদিগকে নিমন্ত্রণমন্ত্রণাদি তাবত ব্যাপারে বর্জ্জিত করিয়া একঘরে করিয়াছে। এ নিমিত্ত আমার বৃদ্ধ শ্বশুব ও শ্বশ্রুঠাকুরানির মনে যে মর্ম্মান্তিত যাতনা দুঃখ জন্মিয়াছিল, সেই গ্লানি দূর করিবার জন্য ইতিপূর্বে রামসিংহ দুই শত টাকা ব্যয় করিয়া দেশের সেই দলাদলি মিটাইয়া দেন। আমি উহাকে তৎকালে এরূপ আশা-ভরসা দিয়া কহিয়াছিলাম যে বিধবা বিবাহের সহকারিতা করিয়া তুমি এই দায়ে পতিত হইলে, অতএব বিদ্যাসাগর ভায়া অবশ্যই কোনো না কোনো কিনারা করিয়া দিবেন। তিনি কোনোমতে অবিবেচনা করিবেন না।' কুসংস্কার থেকে মুক্তি সত্যিই কঠিন। আজও। চিন্তায় ও বক্তব্যে কুসংস্কার মুক্তি পেলেও বাস্তবে তার প্রয়োগের ক্ষেত্রে কখন যেন সেই কুসংস্কার আবার খিড়কি দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ে। সেদিন নিন্দার কাঁটা ও অভিনন্দনের মালা উভয়ই জুটেছিল শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের ও বিদ্যাসাগরের ভাগ্যে। এই আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়ে গ্রামাঞ্চলেও। কলকাতা থেকে প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে আজকের উত্তর ২৪ পরগনার খাঁটুরা গ্রাম তখন বর্ধিষ্ণু গ্রাম। যে গ্রাম সুন্দরবন অঞ্চলের

গৌরব। আমরা কতটুকুইবা জানি সেই গ্রামের কথা, শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের কথা, প্রথম বিধবা বিয়ের কথা। ইতিহাসের পাতা খুঁজলে শুধু তাঁর নামটুকু পাওয়া যায় মাত্র। অথচ উনিশ শতকের এক রক্ষণশীল ভঙ্গকুলীন বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের সন্তান হয়েও প্রথম বিধবা বিয়ে বরমাল্য পরে যে অসীম সাহসিকতা ও প্রগতিশীলতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তা নিঃসন্দেহে নবজাগৃতি। যা আজকের স্বার্থপুর যুগে দাঁড়িয়ে ভাবা তো দূর অস্ত কল্পনায় আনা যায় না। সংস্কৃত কলেজের মতো নামকরা কলেজে অধ্যাপনা দিয়ে জীবন শুরু, পরে হন মুর্শিদাবাদের জজ পণ্ডিত। বাকিটা ইতিহাস।

প্রবন্ধটি নির্মাণে যে সকল গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা, চিঠির সাহায্য নিয়েছি তার একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে উল্লেখিত হলো—

১. চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগর গ্রন্থ, ১৯২৩।
২. রাধারমণ মিত্র, কলিকাতায় বিদ্যাসাগর, ১৯৮২।
৩. যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জীবনী,
৪. গৌরীশংকর ভট্টাচার্য (সঃ), সম্বাদ ভাস্বর, তৃতীয় খণ্ড, ২, ৯, ডিসেম্বর, ১৮৫৬
৫. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭৭৮ শক
৬. বিনয় ঘোষ, বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ, ৩য় খণ্ড, ১৩৬৬
৭. সম্বাদ ভাস্কর, ৯ ডিসেম্বর ১৮৫৬
৮. বিহারীলাল সরকার, বিদ্যাসাগর, ১৩০২
৯. রাজনারায়ণ বসু, আত্মচরিত, ১৯৮২
১০. সম্বাদ ভাস্কর, ১৮ ডিসেম্বর, ১৮৫৬ প্রভৃতি।